নবম অধ্যায়

হিন্দু - মুসলমান সম্পর্ক

নবম অধ্যায়

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

প্রাচীনকালে বাংলাদেশে কোন মুসলমান ছিল না। মধ্যযুগে বাংলায় মুসলমানের আগমন ঘটে। ধীরে ধীরে তারা বাংলার দন্ডমুন্ডের মালিক হয়। দুইজাতি হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর পাশাপাশি বাস করলেও কখনও দুইভাই, আবার কখনও দুই শত্রু হিসেবে থেকেছে; আবার বহু হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে, ঠিক তেমনি মুসলমানও হিন্দু হয়েছে। এই পারস্পরিক মিলন, বিচ্ছেদ এবং একে অন্যের ধর্মগ্রহণ— এই বৈচিত্র্য নিয়েই বাংলাদেশ।

প্রাচীনকালে বাংলাদেশ বলতে "পুন্ড্র, বরেন্দ্র, গৌড়, কর্ণসুবর্ণ, রাঢ়, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত, দন্ডভুক্তি, বঙ্গ, গঙ্গারিডি, সমতট, হরিকেল ইত্যাদি" [১] কে বোঝাত। এই বাংলাদেশের অধিবাসী বহুপ্রাচীন। কারণ এই বাংলায় নানা স্থানে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের, নব্য প্রস্তর যুগের নানা অস্ত্রশস্ত্র ও জীবাশ্মের সন্ধানে পাওয়া গেছে। তাম্র-প্রস্তর যুগেও বাংলাদেশে জাতির অস্তিত্ব ছিল। এই সময়ে "যে সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে মেদিনীপুর জেলার তামজুরি গ্রামে বীরভূম জেলার কীর্ণাহারে, বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে এবং সর্বোপরি ভেদিয়ার কাছে, পান্ডুরাজের ঢিবি'তে"। [২] লোহা'র যুগেরও বাংলাদেশে অজয় নদীর তীরে সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, "সিন্ধু সভ্যতার সমকালে আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা এখানে সমমানের সভ্যতার অধিকারী ছিল।" [৩] নৃতাত্ত্বিক বিচারে বাঙালীরা প্রাচীন অস্ত্রাল জাতির বংশধর। তাদের ভাষা ছিল অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা। যা চেনার কোন উপায় বর্তমানে নেই। এরা "বিশেষ বিশেষ গাছ, পাথর, ফল, জীবজন্তু ও জায়গার ওপর দেবত্ব আরোপ করে তার পূজো করত। কোম বা গোষ্ঠীভেদে এই দেবতা ভিন্ন হতে পারত। লিঙ্গ পূজার প্রচলন ছিল"। [৪] ধীরে ধীরে বাংলাদেশে জৈন, আজীবিক, বৌদ্ধধর্ম প্রাক গুপ্তযুগে বিস্তার লাভ করে। গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটলেও তা উত্তরভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। "উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহকেরা বাংলাদেশের মানুষকে আর্যেতর বলে মনে করত। সংস্কৃত সাহিত্যে এর অনেক প্রমাণ আছে। কথিত আছে রাজা আদিশুর-এর শাসনকালেই এদেশে প্রথম ব্রাহ্মণের পদার্পণ। যদিও অনেকের মতে তার আগেও বাংলাদেশে ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব ছিল।" [৫] শুর, সেন, বর্মন প্রভৃতি অবাঙালী রাজন্যবর্গের আনুকূল্যে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য বাড়ে। এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নিজ স্বার্থ অনুযায়ী সামাজিক নিয়ম, রীতি, ধর্মীয় অনুশাসন সমাজে প্রয়োগ ও প্রচার করে থাকে। সামাজিক সম্মান, সুখ-সুবিধে বেশী পাওয়ায় বিদ্যা ও বুদ্ধিতে তারাই সমাজে অগ্রগণ্য হয়ে পড়ে। গৌড়রাজ শশাঙ্কের সময়ে ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি কম ছিল না। এরা তখন বৌদ্ধদের সহ্য করতে পারত না। ফলে "হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের মধ্যে কলহ বরাবরই চলে আসছিল।" [৬] প্রায়শই বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণ ও রাজকর্মচারীদের হাতে নির্যাতিত হতো। বল্লাল সেনের সমসাময়িক 'কান্দী রাজবাটী'র কারিকায় এর প্রমাণ মেলে "বৈদিক আচারে রাজা মহাসুখী হৈল। বৌদ্ধাচারীগণ প্রতিনির্যাতন কৈল।" [৭] তাছাড়া উচ্চ হিন্দু নিম্নবর্ণের হিন্দুদের নির্যাতন করত, এমনকি রাজারাও তাতে ইন্ধন জোগাতেন। তাই হয়তো পাল যুগে সমাজের নিম্নবর্ণের বিদ্রোহ (কৈবর্ত) হয়েছিল— যদিও তার পেছনে অন্যান্য কারণও ছিল।

এখন আসা যাক, হিন্দু-সৃষ্টির কারণ নিয়ে। 'সিন্ধু' শব্দের পরিবর্তিত রূপ হল 'হিন্দু'। "গ্রীক আক্রমণ থেকে শুরু করে একের পর এক কুষাণ, শক, হুন, গুর্জর হয়ে আরব পর্যন্ত কত জাতিই না ভারতে এসেছে কেউ অস্ত্র হাতে, কেউ বাণিজ্যের পসরা সাজিয়ে, কেউ বা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। শেষ পর্যন্ত তারা ভারতবর্ষ নামে এক বিশাল দেহে লীন হয়ে যায়। সুদীর্ঘ সমন্বয়ের ফলে সংস্কৃত ভাষা আশ্রিত ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মশাস্ত্র বহিরাগত সংস্কৃতির সাহচর্যে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। সে বদলে যায়নি, বরং অর্জন করেছে এক স্বকীয় সত্তা। বিবর্তন ও আত্তীকরণের ফলে ভারতবাসীর মনে এক বিশেষ ধরনের চেতনার উন্মেষ হয় যাকে বলা হয়েছে আর্যাবর্ত চেতনা।" [৮] "কিন্তু তুর্কি আক্রমণ ও সেই সঙ্গে ইসলামের আগমন এই চেতনার ওপর প্রচন্ড আঘাত হানে। এই প্রথম ভারতীয় ধর্ম তথা সংস্কৃতি অপর এক উন্নত ও পরিপূর্ণ ধর্ম তথা সংস্কৃতির মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। রাজশক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় ইসলামের মধ্যে সর্বেশ্বরতার ভাব ফুটে ওঠে। ফলে এক্ষেত্রে আত্তীকরণ ঘটল না। ভারতবাসী নিজেকে যেন গুটিয়ে ফেলল।" [৯] এইভাবে ধীরে ধীরে "হিন্দু বলতে যে ভৌগোলিক অভিব্যক্তির অধিবাসীদের বোঝানো হতো সেই অধিবাসীদেরই সমাজ-সংস্কৃতি, সর্বোপরি ধর্মকে বিশেষিত করা হলো একই হিন্দু শব্দ দিয়ে। একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা রূপান্তরিত হলো একটি সাংস্কৃতিক সংজ্ঞায়। ইসলামের আগমনের পর সুপ্রাচীন ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতির ওপর আরোপিত হলো। জন্ম নিল হিন্দুধর্ম।" [১০] এরপর খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজী নদীয়া জয় করেন ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর থেকে বাংলায় যে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা হল তা ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের দেওয়ানী লাভের আগে পর্যন্ত বজায় ছিল। "১২০৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ৫৬২ বছর সময় কালের জন্য ৭৬ জন মুসলমান, সুবাদার, রাজা, ও নাযিম ক্রমাগত বংগদেশ শাসন করেছেন। তাঁদের মধ্যে ১১জন সুবাদার ঘোরি ও খিলজী সম্রাটদের হাতে নিযুক্ত হয়েছিলেন, ২৬ জন ছিলেন স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা, এঁদের মধ্যে শের শাহের রাজত্বকালের সমসাময়িক শাসকগণও ছিলেন এবং অবশিষ্ট ৩৪জন ছিলেন মোগল সম্রাটদের অধীনস্থ নাযিম।" [১১] সুলতানগণ তাঁদের ইচ্ছামত রাজ্যশাসন

করতেন। ব্রাহ্মণদের দ্বারা অত্যাচরিত নিম্নবর্ণের ও বৌদ্ধগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, এমন কি তারা শাসকদের গুপ্তচরের কাজ করতো। " তারনাথের বিবরণী থেকে জানা যায় যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বখতিয়ার খলজীর গুপ্তচরের কাজ করছিলেন।" (১২)

একদিকে ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি, অন্যদিকে ক্ষমতাজনিত অত্যাচারে ক্লিষ্ট নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধসম্প্রদায় রাতারাতি মুসলমান হয়ে যায়। ইসলাম ধর্মের শরিয়তে ধর্মীয় উদারতা এবং মুসলিম শাসকের আমলে ইসলাম হলে অর্থনৈতিক সুবিধা ও সামাজিক শান্তি লাভ করত। ডঃ মুসা কালিম, তাঁর "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক" গ্রন্থে বলেছেন, "বাঙালী মুসলমানের অধিকাংশ খাস আরব, ইরাক বা তুরস্কের বংশধর নন। নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মতে বেশীরভাগ মুসলমান নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধ হতে ধর্মান্তরিত। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আদমশুমারী রিপোর্টে Mr. H. Beverley বলেন—বাংলার অধিকাংশ মুসলমান বাংলার হিন্দুসমাজের নিম্নশ্রেণী থেকে উদ্ভুত। রিজলি সাহেব তাঁর Tribes and Casts of Bengal গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সহকারে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে বাংলার মুসলমান, বিশেষ করে মুসলমান চাষী বাংলার নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর বংশধর। .... সে যুগে একের উৎসবে ও জীবন যাত্রায় অপরের অংশগ্রহণ করতে কোনো বাধার সৃষ্টি হতো না। হিন্দু মুসলমানের সাংস্কৃতিক মিলন উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ততটা হয়নি যতটা হয়েছিল নিম্নশ্রেণীর ও অশিক্ষিতদের মধ্যে।" (১৩) তাছাড়া হিন্দুদের মুসলমান হওয়ার আর একটি কারণ হোল বিভিন্ন বৃত্তির সুযোগ। অর্থাৎ সে সময় যোগ্যতানুযায়ী নিম্ন হিন্দুরা শাসকের বিভিন্ন পদে যোগদান করার সুযোগ পেত। এ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর "বাংলাদেশের ইতিহাস" গ্রন্থে বলেছেন, "হিন্দু সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা নানা অসুবিধা ও অপমান সহ্য করিত। কিন্তু ইসলাম ধর্মগ্রহণ করিলে যোগ্যতানুসারে রাজ্য ও সমাজে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করার পক্ষেও তাহাদের কোন বাধা ছিল না। বখতিয়ার খলজির একজন মেচ জাতীয় অনুচর গৌড়ের সম্রাট ইইয়াছিলেন। এই সকল দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া যে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত ইহাতে আশ্চর্যবোধ করিবার কিছুই নাই।" (১৪) যুগনায়ক বিবেকানন্দও তাই বলেছেন, " ভারতবর্ষের দরিদ্রের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক মুসলমান কেন? তরবারি বলে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে একথা বলা বুদ্ধিহীনতা। জমিদার ও পুরোহিতদের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের জন্য তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে।" (১৫) শুধু নিম্নবর্ণ হিন্দুই নয়, উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণও উচ্চ রাজপদ বা সম্রাটের সানুগ্রহ লাভের আশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কারণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে রাজনৈতিক বৈষম্য ও জিজিয়া কর প্রদান থেকে নিষ্কৃতি পেত হিন্দুরা। জগদীশনারায়ণ সরকার বৃন্দাবন দাসের লেখা থেকে উক্তি দিয়েছেন তাঁর বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগ) গ্রন্থে—

"হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ;

আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।

হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কর্ম,

আপনি যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম।" (১৬)

হিন্দু ও মুসলমান সম্পর্ক মধুর হয়েছিল চৈতন্য যুগে। বিশেষ করে বাংলার নবাব হুসেন শাহের আমলে। এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান আচারে-ব্যবহারে এমন কি জীবনযাত্রার প্রশ্নেও একত্র হয়েছিল। যেমন খাঁ উপাধি ছিল আফগানি পাঠানদের। সেই খাঁ উপাধি অনেক হিন্দুদের উপাধিতে পরিণত হয়েছে। উভয় সম্প্রদায় এই যুগে যে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়েছেন তার উল্লেখ পাওয়া যায়। "নবাব হুসেন শাহের একাদশ কন্যার সঙ্গে তাঁর অমাত্য মদন ভাদুড়ির অনুরূপ সংখ্যক পুত্রের বিবাহ হয়।" (১৭) এছাড়া বিভিন্ন সময়ে সাধু-সন্তের আবির্ভাব হয়েছে। যেমন নানক, কবীর, তুকারাম, প্রমুখ— যাঁদের শিষ্যগণ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ছিল।

বৃত্তির ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলমানের মিল পাওয়া যায়। যেমন হিন্দুদের মধ্যে যারা মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত তাদের পদবী হয় জেলে আবার মুসলমান হয়ে যারা মাছ শিকার করত তাদের পদবী হয় জোলা। এই জোলা পরিবারেই কবীরের জন্ম হয়েছিল।

দীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি বাস করেছে রাম ও রহিম সৌহার্দ্য বজায় রেখে, পরস্পরের কাছে এসেছে, আচারে-ব্যবহারে, কথা-বার্তায় মিল হলেও মাঝে মাঝেই আবার তারা ভ্রাতৃহত্যায় মেতে উঠেছে, সৃষ্টি হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এর কারণ মূলতঃ মধ্যযুগে পুরোহিততন্ত্র ও মোল্লাতন্ত্র এরাই সমাজ জীবনকে সংক্রমিত করে। এ ছাড়া অমিতাভ চক্রবর্তী তাঁর "সাম্প্রদায়িকতার উৎস ও প্রসার" নামক গ্রন্থে বলেছেন, " (১) বিজেতা ও বিজিতের মানসিকতার ব্যবধান। (২) নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম থেকে দীক্ষিত মুসলমানদের সম্পর্কে উচ্চবর্ণের হিন্দু ও অভিজাত মুসলমানদের বিদ্বেষ। (৩) শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল্যবোধের পার্থক্য। (৪) রাজশক্তির মদতে শাসক সম্প্রদায়ের মনোভাব বদল ও নিম্নবর্ণের মানুষদের প্রতি অত্যাচার। (৫) মৌলবাদী শক্তির আবির্ভাব, শরিয়তি বিধানের প্রত্যাবর্তন। (৬) পুরোহিততন্ত্র ও মোল্লাতন্ত্রের প্রভাবে

দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি।" [১৮] এর ফলে পারস্পরিক সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়, সংঘটিত হয় সংঘর্ষ বা দাঙ্গা।

শাসকশ্রেণীও হিন্দুদের ধর্মেকর্মে আঘাত হানে, মন্দির ধ্বংস করে, তরবারির সাহায্যে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে। "মুঘল সৈনিকেরাও অনেক সময় নববিজিত এলাকায় হিন্দুদের ধর্মকর্মের ওপর আঘাত হেনেছে। তাদের আরাধ্য দেবমূর্তি এবং দেবমন্দিরকে ধ্বংস করেছে। ত্রিপুরা-বিজয়ী মুঘল সৈনিকেরা তথাকার হিন্দুদের ওপর কিরূপ নির্যাতন করেছিল ত্রিপুরার জাতীয় ইতিহাস 'রাজমালা'য় তার উল্লেখ আছে—

চতুর্দশ দেবপূজা নিষেধে যবন।

কালিকা দেবীর পূজা করিল বারণ।" [১৯]

আবার ধর্মান্তরীকরণ প্রসঙ্গে ডঃ অমলেন্দু দে তাঁর "বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ গ্রন্থে ডাঃ জেমস ওয়াইজ"-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন—" ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ জেমস ওয়াইজ লেখেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা মুসলমানদের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে উৎসাহী সৈনিকেরা ভীরু বাঙালী জাতির মধ্যে ইসলামের বার্তা প্রচার করে এবং তরবারির সাহায্যে বল প্রয়োগ করে তাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে।" [২০] নবাব-বাদশাগণ ও তাঁদের সংশ্লিষ্ট সমগোত্রের কর্মচারীগণ হিন্দু রমনীদের বলপূর্বক হরণ বা সাদী করতে শুরু করেন— "মুসলমান রাজা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সিন্ধুকী (গুপ্তচর) লাগাইয়া ক্রমাগত সুন্দরী হিন্দু ললনাগণকে অপহরণ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ময়মনসিংহের জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানগণ এবং শ্রীহট্টের বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানেরা এইরূপ যে কত হিন্দু রমণীকে বিবাহ করিয়াছেন তাহার অবধি নাই।"[২১] এইসব কারণে হিন্দুরা ক্রমশঃ মুসলমানদের থেকে অনেক দূরে সরে যায়— শত্রু ভাবতে শুরু করে।

অন্যদিকে হিন্দুরা মুসলমানদের যবন, ম্লেচ্ছ বলতে শুরু করে, আবার মুসলমানরাও হিন্দুদের কাফের, মালাউন ইত্যাদি বলতে থাকে— যার ফলশ্রুতি সংঘাত। এইভাবে সংঘাতের ক্ষীণ ধারার জন্ম হয়। সেই ক্ষীণ ধারাকে খরস্রোতায় পরিণত করে বৃটিশ শাসকবৃন্দ। তারা এদেশে এসেই এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদ নীতি গ্রহণ করে; কখনও হিন্দু আবার কখনও মুসলমানদের তোষণ নীতি আরোপ করতে থাকে। ফলে প্রত্যক্ষ জঘন্য সংঘর্ষ ঘটেছে এই বৃটিশ আমলেই। তাই বৃটিশ শাসন এত দীর্ঘায়িত হতে পেরেছে।

হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ নবাবী আমলেই সীমাবদ্ধ ছিল কেবল সামাজিক স্তরে, কিন্তু বৃটিশ সরকার কূট-কৌশলে তাকে রাজনৈতিক স্তরে নিয়ে আসে। প্রথমে সরকার সংখ্যাগুরু হিন্দুদের তোষণ নীতি শুরু করে এবং মুসলমানদের দুয়োরানীর চোখে দেখতে থাকে। "কর্ণেল টমাস মনরো বলেছেন,— " যতদিন হিন্দু জনসাধারণ বৃটিশ শাসনের প্রতি অনুরক্ত থাকবে, ততদিন মুসলমানরা অসন্তুষ্ট থেকেও কোম্পানী সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না।" [২২] ফলে ব্যবসা, বাণিজ্যে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে, জমিদারী, সম্মান প্রভৃতি ক্ষেত্রে হিন্দুদের একাধিপত্য বেড়ে যায়। "১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এ দেশীয় সরকারী চাকুরেদের ৮৮.১ শতাংশ ছিলেন হিন্দু।" [২৩] ধীরে ধীরে মুসলমানগণ জমিদারী থেকে বঞ্চিত হয়, নবাবের ক্ষমতা খর্ব হওয়ায় রাজকর্মচারী থেকে মুসলমানগণ বিতাড়িত হয়। বৃটিশ সেনাবাহিনীতে মুসলমান নিয়োগ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। " আমরা মুসলমান ভদ্র শ্রেণীর জন্য সেনাবিভাগ বন্ধ করে দিয়েছি, কারণ আমরা বুঝেছি যে, আমাদের নিরাপত্তার জন্য তাদের ছেঁটে ফেলা দরকার।" [২৪] এইভাবে সীমাহীন শোষণে ও বঞ্চনার শিকার হয়ে মুসলমানদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। "শাসন ক্ষমতা হারিয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে দূরে থেকে, জমিদারী চ্যুত হয়ে, লাখেরাজ সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়ে, আধুনিক শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ে, সরকারী চাকুরী থেকে বঞ্চিত হয়ে কোম্পানীর শাসন আমলে বাংলার মুসলমান অভিজাত শ্রেণী অবলুপ্তির মুখে এসে দাঁড়ায়। তারা মনে করে ইসলামের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতির ফলেই তাদের এই দুরবস্থা। তাই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য মুসলমানদের মধ্যে ফরাজী, ওয়াহাবী প্রভৃতি ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়।" [২৫] মূলতঃ ধর্মসংস্কার আন্দোলন হিসেবে, শুরু হলেও পরে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে মোড় নেয়। নীলকর ও দেশীয় জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচার থেকে বাঁচতে এই আন্দোলনের চেহারা পাল্টে যায়। জমিদার ও নীলকর কেবল দরিদ্র মুসলমানদের শোষণ করতেন না, তাঁরা দরিদ্র হিন্দু কৃষকদেরও শোষণ করতেন। তার ফলে আত্মরক্ষার তাগিদে বহু দরিদ্র হিন্দু এই আন্দোলনে যোগ দেয়। এরপরেই ঘটে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বা মহাবিদ্রোহরূপী সিপাহী বিদ্রোহ। এই সমস্ত আন্দোলনে হিন্দু সংখ্যাধিক্যে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ভীত হয় এবং মুসলমান তোষণ নীতি শুরু করে। তাদের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়, যেমন করেই হোক হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদেরা ঐক্য বন্ধ করা। তাই আলিগড় আন্দোলনে সৈয়দ আহমেদ খানকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত দিয়েছিল বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী।

তারাশঙ্করের সমকালীন যুগে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

বঙ্গভঙ্গের সময়ে তারাশঙ্কর ছিলেন কিশোর, লাভপুর ছিল জাতীয়তাবাদের এক সুদৃঢ় নিগম এবং খুব সহজেই ও আগ্রহের সঙ্গে লেখক এই চেতনার সঙ্গে পরিচিত ও মিশবার সুযোগ পান। এমনিতেই তারাশঙ্কর জমিদার-তনয় হলেও তাঁর চিত্ত ছিল সমাজ সেবায় নিবেদিত। ফলে দেশসেবার সুযোগে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের মূলস্রোতের সংস্পর্শে আসেন। তাছাড়া তারাশঙ্করের মা পাটনার মেয়ে হলেও তাঁর দেশপ্রেম ছিল প্রকট। বঙ্গভঙ্গের সময়ে বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই সমভাবে দুঃখ পেয়েছিল তাও লেখক তাঁর বাবার ডাইরী থেকে উল্লেখ করেছেন, " রাখী বন্ধন অনুষ্ঠান যখন প্রথম অনুষ্ঠিত হয়, তখন তাঁর (বাবার) ডায়রীতে পাই—৩০শে আশ্বিনের ডায়রী। বেঙ্গল পার্টিশন হইয়াছে, হিন্দু-মুসলমান সকল জাতিই মনে মনে দুঃখ পাইয়াছে। বঙ্গদেশের এই দুঃখে বঙ্গবাসীগণ আজ নূতন করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। পরাধীনতায় দুঃখ অনুভব করিতেছেন।" (২৬) অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গে রাঢ়-বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই মর্মাহত হয়েছিল। লেখকের বাল্য বয়সে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বা অস্পৃশ্যতা নিয়ে বিবাদ খুব একটা ছিল না। তিনি " আমার কালের কথা" তে বলেছেন, " হিন্দু-মুসলমানেদের মধ্যে স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতা নিয়েও কোন বিরোধ সেদিন অনুভব করিনি। শুদ্ধাচারী হিন্দু মুসললমানকে স্পর্শ করে কাপড় ছাড়তেন। এ মুসলমানেরা জানতেন। তাঁরাও কোনদিন হিন্দুর বাড়ীতে অন্নজাতীয় আহার্য গ্রহণ করতেন না। মধ্যে মধ্যে সামাজিক নিমন্ত্রণে সিধা এবং ফল মিষ্টান্নের আদান প্রদান চলত।" ".....সমাজগত ভাবে বিরোধ উপস্থিত হলে এর (দাঙ্গা) প্রকাশ্য প্রকাশ সেকালে কদাচিৎ হত। তবু ছিল"। (২৭) গান্ধীজীর অহিংসাবাদ, অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানদের সমভাবে যোগদান করতে তিনি দেখেছেন। ১৯২৫/২৬-এ বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের দফায় দফায় দাঙ্গা শুরু হয়। এর কারণ মূলতঃ ধর্মীয়। "১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা জুলাই কলকাতায় দাঙ্গা, উপলক্ষে হিন্দু কর্তৃক গোহত্যায় মুসলমানদের উপর আক্রমণ।..... কলকাতায় ১৯২৬ খ্রীঃ ২রা থেকে ১৫ই এপ্রিল, ২২শে এপ্রিল থেকে ৮ই মে এবং ১১ই থেকে ২৫ শে জুলাই— এই তিন দফায় ব্যাপক দাঙ্গা ঘটে।" (২৮) আইন অমান্য আন্দোলনের পূর্বে তারাশঙ্কর জেলে যান। এবং জেলে বসেই তিনি জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের স্বার্থপর মনোভাব দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হন। সেই সঙ্গে মুসলীম লীগের নেতৃবৃন্দের স্বার্থপরতা, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি ইত্যাদি দেখে তিনি চিন্তা করেছেন, " তখন জেলখানায় রাজনীতি সর্বস্ব মানুষের চেহারা দেখে ভবিষ্যৎ ভাবনায় শঙ্কিত হয়েছি। .....সব থেকে পীড়িত হলাম আত্ম কলহের কুটিল কদর্যতা দেখে। পরস্পরকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য সে কি ষড়যন্ত্র। মোক্ষম অস্ত্র প্রতিপক্ষকে স্পাই প্রতিপন্ন করা। একের দল ভাঙ্গিয়ে বিশ্বস্ত অনুসারকদের নিজের দলভুক্ত করে নিজের দলকে পুষ্ট করে তোলাটাই তখন মুখ্য কর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।"(২৯) এই সময় মুসলমানদের অনেকগুলি পার্টি গঠিত হয়। যেমন— নিখিলবঙ্গ প্রজা সমিতি (১৯২৯)-এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আক্রাম খাঁ, ফজলুল হক প্রমুখ। এম, এ, এইচ, ইস্পাহানী, আবদুর রহমান সিদ্দিকীর নেতৃত্বে ১৯৩২ খ্রীঃ কলকাতায় "নিউ মজলিস পার্টি" এবং খাজা নাজিমুদ্দিন, হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দি কলকাতায় ১৯৩৬ খ্রীঃ স্থাপন করেন "ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি।" ১৯৩৫ খ্রীঃ পর থেকে মুসলিম লীগের প্রচারের মূল বক্তব্য হয় মুসলমানদের স্বার্থ এবং তার জন্যে ঐক্য। মহম্মদ আলি জিন্না এই সময়ে ফজলুল হককে প্ররোচিত করে মুসলমানদের জন্যে পৃথক রাষ্ট্রের দাবী জানান। শুরু হয় হিন্দু-মুসলমানদের দূরত্বের ফারাক। জিন্নার চিন্তা বা কৌশল স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে আজও সমানভাবে ক্রিয়াশীল। তারাশঙ্কর তাই বলেছেন, "ইংরেজ চলে গিয়েছে, আজ সে কদর্যতা নখরদন্ত প্রকাশ করে যুধ্যমান।" (৩০) পরে তিনি রাজনীতির প্রত্যক্ষ সংস্রব ত্যাগ করে সাহিত্য সাধনা ও সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু সেখানেও নানা বাধা, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার সম্মুখীন হয়ে এই মানুষটাই আবার সংকল্প করেছিলেন, " বেঁচে থাক কংগ্রেস, ওরই মধ্য দিয়ে জেল খেটে কাটিয়ে দেব জীবন।" (৩১) এই উক্তির মূল কারণ হল তারাশঙ্কর ছিলেন গান্ধীবাদী ও প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাসী।

১৯৪৬ সালে কলকাতা সহ অন্যান্য অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় যার পশ্চাতে ছিল মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ উস্কানি। এ প্রসঙ্গে ডঃ নজরুল ইসলাম বলেছেন, " কে দাঙ্গা সত্যিকার বাঁধিয়েছে সে প্রশ্নে না গিয়েও বলা যায় যে, মুসলিম লীগই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল। মুসলিম লীগই ময়দানে সভা ডেকেছিল। মুসলিম লীগই রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল কাজেই দাঙ্গা যাতে না ঘটে তা দেখার দায়িত্ব মুসলিম লীগ সরকারের ওপরেই পড়ে। আর সে দায়িত্ব সরকারের প্রধানমন্ত্রী এড়াতে পারেন না। তাছাড়া মুসলিম লীগ নেতাদের উত্তেজনামূলক প্রচার যে দাঙ্গা বাধাতেও সাহায্য করেছিল তাতে কোনরকম সন্দেহ নেই।" (৩২) এই দাঙ্গার কদর্যরূপ তারাশঙ্কর স্বচক্ষে দেখেছেন আবার গ্রামবাংলায় রাম ও রহিম কত স্বচ্ছ, কত নির্মল তাও তিনি দেখেছেন। রাজনীতির কূটচালে দাঙ্গা ঘটেছে, মুষ্টিমেয়ের স্বার্থে অসংখ্য নিরীহ, নিরপরাধ, রাম ও রহিমের মৃত্যু ঘটেছে,—তাও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর সাধনা ছিল রাজনীতি, স্বার্থ, জাতপাতের উর্দ্ধ "মহিমময় মানুষের, মানুষের মহিমাকে" (৩৩) তিনিই সবক্ষেত্রেই সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছেন। ভারত স্বাধীন হয়েছে কিন্তু তিনটা টুকরো হয়ে। বাংলাদেশও ভাগ হয়েছে— এসবের মূলে ছিল সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধিতে মোহান্ধ বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তি ও উচ্চবিত্ত হিন্দু-মুসলমান। কিন্তু নীচু তলার হিন্দু মুসলমান দায়ী নয়। "সমাজের কোনো কোনো স্তরে বিশেষত রাজনৈতিক স্তরে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যতো দ্বন্দ্বই থাক, সমাজের নীচু মহলে পারস্পরিক সহাবস্থানই লক্ষ্য করা যায়।" (৩৪)

বীরভূম জেলায় হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর পাশাপাশি সহাবস্থান করেছে, বর্তমানেও আছে। লেখকের আমলে এমন বহু গ্রাম ছিল যেখানে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় ঠ্যাঙাড়ে হিসেবে খ্যাত ছিল। মুসলমান-ঠ্যাঙাড়েদের গ্রাম ছিল বামুনিগ্রাম, বজরাহাট ও হিন্দু-ঠ্যাঙাড়েদের গ্রাম ছিল আখড়াইয়ের দীঘি, সুঁদীপুর প্রভৃতি। "তারাশঙ্কর নিজেও একবার বাইসাইকেলে সাঁইথিয়া যাবার পথে ঠ্যাঙাড়েদের পাল্লায় পড়েছিলেন, ভাগ্যজোরে বেঁচে যান।" (৩৫)

লাভপুর সংলগ্ন গ্রামের মুসলমানদের বেশীরভাগ আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল ছিল না, পেশায় তারা কৃষক শ্রেণীভুক্ত। তারাশঙ্কর স্থানীয় মুসলমানদের বংশানুক্রমিক পরিচয় যা দিয়েছেন, তাতে বোঝা যায় যে অনেকেই হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত। "আমাদের গ্রামের পাশে ঠাকুর পাড়া। তারপর পশ্চিম পাড়া। তার ওদিকে ব্যাপারী পাড়া। ব্যাপারী পাড়ার পাশে ছোট গোগা, শেখপাড়া, একখানা গ্রাম পার হয়ে পুরনো মহুগ্রাম, কামারঘাট, ফলগ্রাম। এগুলি সব মুসলমানদের বসতি। এককালে ঠাকুরপাড়ার ঠাকুরেরা ছিলেন এ অঞ্চলের অধিপতি। ঠাকুরেরা মুসলমান। এঁরা ছিলেন নাকি যোগী বংশের সন্তান, তাই লোকে বলত ঠাকুর। শুধু এ অঞ্চলে ভূমির অধিপতিই ছিলেন না; মুসলমানদের ধর্মগুরুও ছিলেন। .....অনেক সন্ধান করেছি, সন্ধান করে আমার মনে হয়েছে, কোন কালে এঁরা ছিলেন হিন্দু এবং ধর্মগুরু ব্রাহ্মণই ছিলেন। কোন মতে স্বধর্মচ্যুত হয়েছিলেন এবং হয়েছিলেন তাঁর স্বজাতীয় কোন ব্রাহ্মণ প্রতিপক্ষেরই চক্রান্তে। তার ফলে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিষ্য যজমান ভক্ত সকলেই ইসলাম অবলম্বন করেছিলেন।" (৩৬) লেখকের আমলেও হরিজন কৃষক সম্প্রদায় নানা কারণে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে। বীরভূমে এমন সম্প্রদায় আছে যারা আচারে হিন্দু, কিন্তু ধর্মে মুসলমান। এদের নিয়ে তারাশঙ্কর অনেকগুলি গল্প লিখেছেন যেমন বেদেনী, রাঙাদিদি, কামধেনু প্রভৃতি। বর্তমানে এই সম্প্রদায় প্রায়-অবলুপ্তির পথে।

বিংশ শতকে জমিদার ও মহাজনদের কূটকৌশলে এবং নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করেছে। সাম্প্রদায়িকতা মূলতঃ ইংরেজদের আগমনের সময় থেকেই শুরু হয়। জমিদারগণ কর বৃদ্ধি করলে যদি প্রজারা প্রতিবাদ করতো তখন জমিদারগণ প্রজাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে চালিয়ে দিতেন। এই ঘটনা তারাশঙ্কর "ধাত্রীদেবতা" উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন, "জামালপুরের কৃষকরা যখন ঐক্যবদ্ধভাবে জমিদার-মহাজনের কর-বৃদ্ধি ও পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়, তখন ঐ সকল জমিদার মহাজনেরা এই বিদ্রোহকে (১৯০৭ খ্রীঃ হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ নামে রটনা করে। যুগান্তর দলের স্বেচ্ছাসেবক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা তখন হিন্দু জনসাধারণকে রক্ষা করতে আসেন এমনকি এ খবর কলিকাতায় পৌঁছাবার পর আরো কিছু বিপ্লবী বোমা, পিস্তল, রিভলভার নিয়ে হিন্দুদের সাহায্য করতে আসে। জামালপুরের কৃষকদের জমিদার-মহাজন বিরোধী অভ্যুত্থান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হয় এবং এইভাবেই বিপ্লবীদের সহায়তায় জমিদার-মহাজনদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।" (৩৭) অথচ যেখানে জমিদার-মহাজনদের শোষণ ছিল না, থাকত না কর আদায়ের নামে দস্যুবৃত্তি, সেখানে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পাশাপাশি বাস করত। হিন্দুদের উৎসবে বা মন্দিরে মুসলমানরা আসত আবার মুসলমানদের দরগায় হিন্দুরা যেত। তারাশঙ্কর তাঁর "পঞ্চগ্রাম" উপন্যাসে এক সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন— "হিন্দুদের কয়েক বাড়ীতেও মহরমের পর আসিত লাঠিয়ালের দল, তাহারা সেখানে বৃত্তি পাইত। পীরের দরগায় হিন্দু বাড়ীর মানসিক চিনি-মিষ্টির নৈবেদ্য এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। কঠিন শূলরোগের জন্য দেখুড়িয়া কালীবাড়ীতে আজও মুসলমান রোগী আসে।" (৩৮) 'গণদেবতা'য় অম্বুবাচীতে চাষের পূর্বে যে কুস্তির লড়াই হয় তার বর্ণনা আছে, যার আঞ্চলিক নাম "আমুতির লড়াই"— হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই যেটি সমারোহের বস্তু।

তারাশঙ্করের ওটি কয়েক গল্প রয়েছে, যেগুলি হিন্দু-মুসলমান সংশ্লিষ্ট। তার মধ্যে কোনটা দাঙ্গাক্লিষ্ট, আবার কোনটা একান্তই সামাজিক। সামাজিক হিসেবে—রাঙাদিদি, ইমারত, কামধেনু, একটি যাদুকরের মৃত্যু, আফজল খেলোয়াড়ী ও রমজান শের আলি প্রভৃতি গল্প— যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এছাড়া মন্বন্তর ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা "আখেরী" ও দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা কান্না, বিস্ফোরণ, কলকাতার দাঙ্গা ও আমি, জটায়ু প্রভৃতি গল্প উল্লেখ্য।

সাম্প্রদায়িকতা ঃ— 'সম্প্রদায়' বলতে জাতি, বর্ণ, অঞ্চল, ভাষা, জীবিকা বা ধর্মের ভিত্তিতে পরস্পর নৈকট্য অনুভব করে এমন এক জনসমষ্টিকে বোঝায়। "প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কিছু নিজস্ব চরিত্র, চিন্তা, ও চেতনা আছে। বিশেষ একটি স্বার্থ তাদের মধ্যে ঐক্যের ধারণা সৃষ্টি করে। এই স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনেই তারা সংগঠিত হয়।" (৩৯) সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ থেকেই সাম্প্রদায়িকতার জন্ম হয়। কোনো ব্যক্তির সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বদরুদ্দীন উমর বলেছেন, " কোন ব্যক্তির মনোভাবকে তখনই সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হয় যখন সে এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় ভুক্তির ভিত্তিতে অন্য এক ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরণ এবং ক্ষতিসাধন করতে প্রস্তুত থাকে। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতিসাধন করার মানসিক প্রস্তুতি সেই ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় বা বিরুদ্ধতা থেকে সৃষ্ট নয়। ব্যক্তি বিশেষ এখানে গৌণ, মুখ্য হ'ল সম্প্রদায়"। (৪০) যদিও কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় নিজেকে সাম্প্রদায়িক ভাবতেই পারে না। "আমরা যাকে সাম্প্রদায়িক দাবি বলি সেই সম্প্রদায়ের কাছে তা ন্যায়সঙ্গত দাবি। আমাদের দৃষ্টিতে যা সাম্প্রদায়িক চেতনা সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত চেতনা। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে আমরা

যে আন্দোলনগুলিকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিই, সেই সম্প্রদায়ের কাছে আন্দোলনগুলি আত্মপরিচিতি লাভের, আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার, বঞ্চনা ও শোষণ মুক্তির সংগ্রাম।" (৪১) এই জঘন্য সাম্প্রদায়িকতার প্রসারে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের উগ্রজাতীয়তাবাদী লেখকদের রচনা অনেকাংশে সাহায্য করেছিল। উভয়েই তাঁদের লেখার মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, দীর্ঘদিন সহাবস্থানের ফলেও উভয়ের সংস্কৃতির সমন্বয় গড়ে ওঠেনি। এঁদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তোষণনীতি গ্রহণ করেছিল সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার। এই কারণেই ভারতে বৃটিশ-শক্তি এতদিন নির্বিঘ্নে রাজত্ব করতে পেরেছিল। চিরাচরিত ভারতীয় সনাতন সমাজ ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করে দেয়। জমির ব্যক্তিগত মালিকানা দান ও গ্রামবাংলায় নতুন জমিদার, মহাজন ও দালালশ্রেণীর সৃষ্টি করে, যার থেকে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম হয়। এদের সঙ্গে শুরু হয় ইংরেজ বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বন্দ্ব, জন্ম হয় বুদ্ধিজীবীদের— যারা সাম্রাজ্যবাদীদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী ধরে ফেলেন এবং নিজ স্বার্থ রক্ষায় তৎপর হন।" "মার্কসীয় ঐতিহাসিকবৃন্দ সর্বভারতীয় স্তরে শ্রেণীবিভক্ত সমাজকে কল্পনা করেন এবং বর্ণ, অঞ্চল ও ধর্মভিত্তিক চিরাচরিত সামাজিক বিভাজনের ওপর শ্রেণীবিভাজনকে স্থান দেন।" (৪২) মার্কসীয় ঐতিহাসিকদের মতে বস্তুগত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের ফলেই সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ ও প্রসার ঘটে। "মার্কসীয় ঐতিহাসিকবৃন্দ সেইজন্য সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে ভ্রান্তচেতনা বলে মনে করেন। দাঙ্গাগুলি অসম অর্থনৈতিক উন্নয়নের মান ও আর্থ সামাজিক বৈষম্যের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।" (৪৩) সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষোভই হল দাঙ্গার মূল কারণ।

সাম্প্রদায়িক মনোভাব থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মুসলমান পর্যন্ত অনেকেই স্বাধীনতা আন্দোলন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎসাহ ও যোগদান করেছিলেন। "বিখ্যাত চট্টগ্রাম-বিপ্লবের নায়ক সূর্য সেন, কল্পনা দত্ত, তারকেশ্বর দস্তিদার, কালী দে প্রমুখ গ্রামাঞ্চলের মুসলমান কৃষকদের ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন। নিদারুণ নিপীড়ন ও উৎকণ্ঠার দিনগুলিতেই মুসলমান জনগণের ম্লান মুখগুলি সূর্য সেন এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেন নি। ......কল্পনা দত্ত এক সাক্ষাৎকারে তাঁদের সম্বন্ধে বলেছেন, তাঁরা (মুসলমানগণ) জীবনের অনেক কিছুই হারিয়েছেন কিন্তু যে অক্ষয় সম্পর্ক এখনও তাদের মনের মণি কোঠায় সঞ্চিত আছে তা হল এই সহজ সরল মুসলমান কৃষককুলের অদম্য ও অকৃত্রিম ভালবাসা।" (৪৪)

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাক্কালে যে সব মুসলমান সংগঠনগুলি গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে ১৯১৯ খ্রী:'জামিয়াত উলেমা, জন্ম লগ্ন থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে থেকেছে এবং অজস্র সদস্যকে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণ করেছে। ১৯২৯ খ্রী: পাঞ্জাবে 'মজলিস-ই আরহার' নামে আর এক সংগঠন ভারতের স্বাধীনতার জন্যে আত্মোৎসর্গ করেছিল। বেলুচিস্তানের 'সমরু আল্লা বক্স' মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমরণ-সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়কে ভিন্নজাতি হিসাবে বিবেচনা করার জন্যে মুসলিম লীগের যে দাবি তা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। কোরানের সত্যকার শিক্ষা অনুযায়ী যে মুসলমানের ঈশ্বর-বিশ্বাসী চরিত্র, সে সকল জাতির মানুষের মধ্যে শান্তি ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস চালাতে পারে। ধর্মের ভিত্তিতে বর্তমান বিশ্বের যে বিভাজন তা মূলতঃ কৃত্রিম এবং ভ্রান্ত, এমন কি ভয়ানক বিপজ্জনকও।" (৪৫) তাহলে দেখা যায় যে সাম্প্রদায়িকতা প্রসারে মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতা ও মৌলবাদীদের চক্রান্তেই মূলতঃ সাহায্য করেছিল এবং আজও তা ঘটে চলেছে তাই বলা বাহুল্য। সাম্প্রদায়িকতার প্রেক্ষাপটে তারাশঙ্করের গল্পগুলির মধ্যে "কান্না", "বিস্ফোরণ", "জটায়ু", "কলকাতার দাঙ্গা ও আমি উল্লেখযোগ্য"।

কান্না ঃ- এক হিন্দু-সন্তান অল্পবয়সে অনাথ হয়ে এক মুসলমান রমণীর কাছে মানুষ হয়। সেই বিধবা রমণী ছেলেটির নাম রাখেন জনি। সে বড় হতেই বস্তির পরিবেশের নোংরা স্পর্শ তার গায়ে লাগে। সে নানা অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। বিধবা রমণী চুড়ি বিক্রি করতেন, সেই সঙ্গে ছেলেমেয়ে চুরি করে বিক্রি করতেন। কিন্তু জনিকে তিনি বেচতে পারেন নি। জনির 'নানী' আহ্বানে রমণীর যেন কেমন স্নেহ সঞ্চারিত হয়েছিল। বস্তিটা ছিল অত্যন্ত অসামাজিক। কলকাতার এন্টালীর কাছে এই বস্তিতে তারা "একটু সেয়ানা হলেই ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানের তাঁবেদারি করে, কাটা ঘুড়ির পিছনে পিছনে ছোটে, মিথ্যে করে রাস্তায় পড়ে কাতরে কাতরে ভিক্ষে চায়, ভাল পোশাক পরা লোক দেখলে বলে 'সেলাম হুজুর'। বলে আর সেলাম বাজিয়ে ভিক্ষের জন্যে পিছনে পিছনে চলে; ভিক্ষে না পেলে গালাগাল দেয়। .... বড় হয়ে গাঁট কাটে, ছুরি মারে গুন্ডাগিরি করে— তাদের বাল্যকালটা হল এই রকম।" (৪৬) এই গুন্ডাদের মধ্যে আছে হালিম, রহমান, দবির, টম, হ্যারি, শুকলাল, কিষণ প্রভৃতি। একদিন হালিম ও দবির নানীকে ছুরি মেরে হত্যা করে। জনি থানায় গিয়ে হালিম ও দবিরের নাম বলে ধরিয়ে দেয়। প্রমাণ অভাবে খালাস পেয়ে তারা জনিকে হত্যা করতে উদ্যত হলে এক খ্রীষ্টান ফাদার নিজের প্রাণের বিনিময়ে জনিকে বাঁচান, কিন্তু হালিমের দল জনির দুচোখ অন্ধ করে দেয় এবং অন্ধ জনি গড়ের মাঠে প্রতিদিন গান গেয়ে বেড়ায়।

এই গল্পটি বাংলা ১৩৫২ সালে প্রকাশিত হয়— যখন তারাশঙ্কর ফ্যাসী-বিরোধী লেখক সঙ্ঘের সদস্য। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় তখন সাম্যবাদের ঢেউ উঠেছে, শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্যে মিটিং, সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তখনই তিনি এই গল্পটি লেখেন। "বিশ্বরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দুই শিবিরে বিভক্ত পৃথিবীর মানুষ আজ আপন আপন আদর্শ, আপন আপন দাবি নিয়ে দৃঢ়-পদক্ষেপে ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। অন্নহীন, বস্ত্রহীন মানুষের

কোনদিন না কোনদিন মানুষ অকপটে নিজের পাপ স্বীকার করতে অবশ্যই পারবে।" (৪৮)

বিস্ফোরণ ঃ- সাম্প্রদায়িকতার বিষময় পরিণামের সার্থক রূপায়ণ "বিস্ফোরণ" গল্পটি। রামতারণ মোটর গাড়ীর ড্রাইভার, কিন্তু তার হিন্দুয়ানা প্রকট। তার বন্ধু ইসমাইল অচলগাড়ীকে সচল করে দেয়। তাইজন্যে তার অহংকার পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। উভয়ের মধ্যে মৌখিক বন্ধুত্ব হলেও আন্তরিক হয়নি। উপরন্তু ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট তারিখে ইসমাইল রামতারণের কারখানায় না এসে দাঙ্গায় যোগ দিয়েছে। রামতারণ মুসলীম লীগের মিছিলে ইসমাইলকে "আল্লা-হো-আকবর" ধ্বনি তুলে ডান্ডা ঘুরিয়ে নাচতে দেখেছে। রামতারণের চিন্তার জগতে "কলকাতায় দাঙ্গার ভয়াবহতা কত নির্মম হবে" এই ভেবে দিশাহারা। ধীরে ধীরে দাঙ্গা বীভৎস রূপ নেয়। "কলকাতা কালো হয়ে গেল। লাল আগুন নিবে অঙ্গার হল। লাল রক্ত শুকিয়ে পচে কালো রঙ ধরল। নোয়াখালি হল, বিহার হল। কলকাতায় দাঙ্গা থামে আবার লাগে, লাগে আবার থামে।" (৪৯)

এমন একদিন রাত্রে কারখানায় আকণ্ঠ মদ্যপান করে তিন বন্ধু, রামতারণ, নটবর এবং ইসমাইল। রাস্তার দুদিক থেকে "আল্লা-হো-আকবর" এবং "জয় হিন্দ" ধ্বনি আসে। ঘরে বসে তারা দাঙ্গার ভয়ঙ্করতা উপলব্ধি করে। রামতারণ হঠাৎ তার নিষ্পাপ বন্ধু ইসমাইলকে ছোরা দিয়ে হত্যা করে এবং মেঝেতে রাখা বোমাটা নিয়ে মেঝেতে প্রচন্ড আঘাত দিয়ে ঠোকায় প্রচন্ড বিস্ফোরণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় রামতারণ আর তাদের বন্ধু নটবরদার দেহ।

দাঙ্গার ফল ভয়াল ও ভয়ঙ্কর, যেখানে দরিদ্ররাও নিস্তার পায় না। হিন্দু-মুসলমানের সুমধুর মিলন সাগরে চীড় ধরে।, অতিপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহ করে। মৌলবাদীদের চক্রান্তের শিকার হয় নিষ্পাপ ইসমাইলের দল। যদি সে মুসলিম লীগের মিছিলে যোগ না দিত তাহলে তাকে এ ভাবে মরতে হত না হয়তো। অন্যদিকে রামতারণ আত্মহত্যার মাধ্যমে বিড়-বিড় করে কী যেন বলতে থাকে, মনে হয় দাঙ্গার ফলশ্রুতি। এ ভাবেই অন্যকে হত্যা করে সে কিন্তু নিজেও সুখী হয় না, তাকেও এভাবেই আত্মঘাতী হতে হয়। দাঙ্গার ফলে স্বার্থবাজরা নিজেদের স্বার্থ গুছিয়ে নেয়, মরে কিন্তু নিরীহ মানুষের দল অর্থহীনভাবে। নটবরের মৃত্যু সেই ইঙ্গিতই বহন করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎস রূপ (৪৬ এর কলকাতা'র) এমন বাস্তব ও সার্থক রূপায়ণ তারাশঙ্করের নির্ভীক লেখনীতেই সম্ভব। রামতারণ হয়তো নিজের জীবন দিয়ে বলেছিল— ভ্রাতৃহত্যার হোক অবসান, হিন্দু-মুসলমান মধুর সম্পর্ক নিয়ে বাস করুক। আসুক নেমে অহিংসা —যা গান্ধীবাদী লেখকেরই অন্তরের কথা।

বর্তমানেও হিংসা, হত্যা, সাম্প্রদায়িক অসন্তোষের অবসান হয় নি। মানুষের মধ্যে যতদিন কুপ্রবৃত্তি বিরাজ করবে, জীইয়ে রাখবে স্বার্থপরতা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যতদিন রাঘব বোয়াল সেজে থাকবে, দেশে দারিদ্র্য যতদিন প্রকট থাকবে, ততদিনই এই বিষময় নাটকের কদর্য অভিনয় চলবেই— এই সত্য বোঝাতেই লেখক বেশ সুন্দর ও সার্থক কৌশল অবলম্বন করে গল্পের সমাপ্তি টেনেছেন, " ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন রামতারণ বিড়বিড় করে কি বলছে। বিস্ফোরণের শব্দের রেশের মধ্যে তা বোঝা যাছে না। " (৫০)

সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণের প্রসঙ্গে এ, আর, দেশাই মন্তব্য করেছেন, সাম্প্রদায়িকতা বিভিন্ন ধর্মের কায়েমী স্বার্থবাদীদের সংগ্রামের ছদ্মবেশ মাত্র। এরা এই বিরোধকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেয়। তিনি আরও বলেছেন, " সাম্প্রদায়িকতা দমন করার অন্যতম কার্যকরী উপায় হলো বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিম্নবর্গকে তাদের সর্বজনীন অর্থনৈতিক ও অন্যান্য স্বার্থরক্ষার আন্দোলনে একত্রিত করা।" (৫১)— যা তারাশঙ্করের প্রাণের কথা ছিল।

পাদটীকা

১।	বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক	:	ডঃ নজরুল ইসলাম	পৃ. ৩
২।	বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম খন্ড	:	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৮/১৫
৩।	বাংলাদেশের ইতিহাস ১ম খন্ড	:	ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার	পৃ. ১৮
৪।	বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক	:	ডঃ নজরুল ইসলাম	পৃ. ২১
৫।	বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)	:	নীহাররঞ্জন রায়	পৃ. ২৭০/২৯৯
৬।	প্রাগুক্ত	:	ডঃ নজরুল ইসলাম	পৃ. ৩৫

শ্রমশক্তি, তার উপার্জন, তার জীবন-মৃত্যু নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলেছে। ভাগ্যের দোহাই দিয়ে, ধর্মের নামে ঈশ্বরের বিধানের নির্দেশ ঘোষণা করে পৃথিবীকে দুঃখ জর্জর করে তুলেছে—তারই প্রতিকার করবে বিপ্লব। তাই বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।" [৪৭] এদিকে কলকাতার আকাশে-বাতাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছে মানুষ তার মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে; সকলের কাছে তখন ছোরা থাকত। মানুষ মানুষকে হত্যার মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পেত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ) সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে থাকে কারণ যারা দরিদ্র, মৃতপ্রায়, তারাই এই দাঙ্গার মাঝেই নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজে পেতে চেষ্টা করে।

জটায়ু :- এই গল্পটিও হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বের পরোক্ষ ফল। স্বাধীনতার সঙ্গে ভারত হয় দ্বিধাবিভক্ত, ফলশ্রুতিতে রাম-রহিমে দিবারাত্র দ্বন্দ্ব। এই সময়ে বেশ কিছু অমানুষ দাঙ্গায় মাতে বা লুটতরাজে অংশ নিয়ে বিখ্যাত সমাজবিরোধী হয়ে যায়। লোক-চক্ষু ও পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন বেশ, নাম পরিবর্তন করে তারা আত্মগোপন করতে থাকে। কিন্তু অন্তরের গহণে সুপ্ত পাশব প্রবৃত্তি সুযোগ পেলেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এমনই এক কদর্য চরিত্র কালা গোঁসাই। কলকাতার বিখ্যাত সমাজবিরোধী খুনী নেপাল গুন্ডা। অসামাজিক কাজের জন্যে "গুন্ডা আইন" এর হাত থেকে বাঁচতে বাংলা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে কলকাতা নেপাল, বিহারে কালা গুন্ডা এবং পূর্ববঙ্গে কাদু সর্দার হয় দেশ বিভাগের উত্তাপ কিছুটা প্রশমিত হলে নেপাল, বীরভূমের এক গ্রামে আসে। এখানে এসে নিরীহ, শান্ত, সহজ, সরল গ্রামবাসীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। সে নবগ্রামের এক গাছতলায় শিব প্রতিষ্ঠা করে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের শান্তি আনার জন্যে চাঁদা আদায় করতে থাকে। শিবতলায় বসে কালা গোঁসাই বিভিন্ন রোগের দাওয়াই দিতে শুরু করে। কখনও মুসলমান ফকির সেজে, আবার কখনও গলায় রুদ্রাক্ষের মালা হাতে চিমটে নিয়ে সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে মুসলমান ও হিন্দুদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করত। চাঁদা নেওয়ার ফিকির ছিল হিন্দুদের কাছে "হিন্দুকে বাঁচানেকে লিয়ে চন্দা। বাবা বিশ্বনাতকে হুকুমত। হিন্দুকে ধরম যাচ্ছে। পাঁচ হাজার দশ হাজার কলকাত্তা, নোয়াখালি, জেনানীর হিন্দুর ইজ্জত, ধরম বচানোকে লিয়ে চন্দা।" মুসলমানদের কাছে— "মুসলমানদের বাঁচাতে হবে পয়গম্বরের হুকুমত, কায়েদে আজমের ফরমান নিয়ে এসেছে।" এইভাবে সে যেমন উভয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে টাকা রোজগার করেছে, আবার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণ্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। বর্তমানেও এমন জঘন্য চরিত্র সমাজে দুষ্ট-ক্ষতের মত বিরাজ করছে।

কলকাতার দাঙ্গা ও আমি :- কলকাতায় থাকার পর তারাশঙ্কর স্বগ্রামের মাটিতে ফিরছেন। কলকাতায় তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষময় রূপ পরিগ্রহ করেছে— রাম-রহিমে ভ্রাতৃত্ববোধ বিস্মৃত হয়ে পারস্পরিক খুন জখমে লিপ্ত। ষ্টেশনে নেমে লেখক এক মুসলমান গাড়োয়ানের গাড়ীতে চড়ে গ্রাম লাভপুরে ফিরছেন, সঙ্গী কেবল বৃদ্ধ-বাউল নিতাই দাস। সাত মাইল দূরত্বে সুন্দীপুরের সেই ভয়াল বিভীষিকাময় বটতলা। যার পরিচয় ইতিপূর্বে বিশদ আলোচিত হয়েছে। এই গাছের নীচে শতাব্দী ধরে হিংস্রতা, হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ, রাহাজানি চলেছে। সেই বটতলাতে আসতেই উঠল প্রচন্ড ঝড়— তিনজনেই ত্রস্ত, ভীত। এই বটতলাতেই গাড়োয়ান সেজে মুসলমান ডাকাত পথিকদের ভুলিয়ে এনে খুন করে টাকা-পয়সা সব কেড়ে নিত— এ ঘটনা শুধু লেখকের নয় সমকালীন ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেয়। বৃদ্ধ নিতাই বাউল এই অবস্থায় বলতে থাকে যে এখন পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হল সত্য-কথন। নিজের পাপের কথা কেউ যদি অকপটে স্বীকার করে তাহলে কোন পাপই এই তিনজনের কারুরই কোন ক্ষতি করতে পারবে না। নিতাই তখন পল্লীর সেই মুসলমান গাড়োয়ানকে প্রশ্ন করতে সে (গাড়োয়ান) নির্দ্বিধায় 'হ্যাঁ' বলল। কিন্তু লেখক কোন উত্তর দিতে পারলেন না। সভ্য মানুষ সত্য-কথনে নিজের পাপ স্বীকার করতে অপারগ, অথচ নিরীহ, অশিক্ষিত পল্লীর সরল মানুষ সত্য-কথনে নির্ভীক।

লেখক এই গল্পের মাধ্যমে শিক্ষিত, সভ্যতাভিমানী, শহুরে অভিজাতবর্গের কুৎসিত রূপের দিকটির নির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ শিক্ষিত থেকে রাজনৈতিক নেতারা পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কেউই অকপটে নিজের পাপ কোনদিন স্বীকার করতে পারবেন না, কারণ শিক্ষা ও আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে এঁরাই নিজেদের আখের গোছাতে দিবারাত্র সমাজের বুকে অন্যায় করে চলেছেন— নিজেদের বিবেক নিজেরাই হত্যা করেছেন। এই সম্প্রদায়ই যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির মূলে রয়েছেন, এই নির্দেশও দিয়েছেন লেখক। রামা কৈবর্ত কিংবা রহিম শেখের দল যে শুধু পারস্পরিক ধ্বংস ও হত্যালীলায় মেতে ওঠে তার উৎসাহ দাতাগণ হলেন এই শহুরে শিক্ষিতের দল।

বর্তমানেও তাই দেখা যায় যে, রাম-রহিমের সংঘর্ষের মূলে রয়েছে শিক্ষিত মৌলবাদীদের গভীর চক্রান্ত। গল্পটি একেবারে বর্তমান দিনেও বাস্তব ও সার্থক সৃষ্টি— যা সমভাবে প্রযোজ্য। তারাশঙ্কর নিজে শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও নিজের অসাফল্যের দিকের সত্য নির্দেশ করতে কার্পণ্য করেন নি। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে, তিনি কত বড় মাপের মহৎ শিল্পী। তিনি আশাবাদী ও ভারতীয় সনাতন আদর্শে বিশ্বাসী, তাই তিনি নিশ্চিত যে আজ না হয় আগামী দিনের প্রজন্ম একদিন নিজের পাপ সত্যভাবে স্বীকার করতে পারবে একথাই তিনি গল্পের অন্তিম লগ্নে [redacted] ইঙ্গিত দিয়েছেন, "আগামীকালে

৭।	বাঙ্গালার ইতিহাস	:	ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত	পৃ. ৫৩
৮।	ভারতবর্ষ ও ইসলাম	:	সুরজিৎ দাশগুপ্ত	পৃ. ৩১
৯।	ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হিন্দু-মুসলমান	:	অঞ্জন গোস্বামী	পৃ. ৩
১০।	ভারতবর্ষ ও ইসলাম (১৩৯৮)	:	সুরজিৎ দাশগুপ্ত	পৃ. ৩৪
১১।	বাংলার মুসলমান (মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক অনূদিত)	:	খন্দকার ফজলে রাব্বি	পৃ. ৩২
১২।	বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগ)	:	জগদীশনারায়ণ সরকার	পৃ. ৬
১৩।	মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক	:	ডঃ মুসা কালিম	পৃ. ১১
১৪।	বাংলাদেশের ইতিহাস (২য় খন্ড)	:	রমেশচন্দ্র মজুমদার	পৃ. ২৩১/৩২
১৫।	স্বামীজীর রচনা সংকলন (৮ম খন্ড)	:		পৃ. ৩৩০
১৬।	বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগ)	:	শ্রীজগদীশনারায়ণ সরকার	পৃ. ৯
১৭।	দাঙ্গার ইতিহাস (মিত্র ও ঘোষ)	:	শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ১৫
১৮।	সাম্প্রদায়িকতা : উৎস ও প্রসার	:	অমিতাভ চক্রবর্তী	পৃ. ১৩
১৯।	মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ (ঢাকা - ১৯৮৬) : মহম্মদ আবদুল জলিল			পৃ. ২৬০
২০।	বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ	:	ডঃ অমলেন্দু দে	পৃ. ১২১
২১।	বৃহৎ বঙ্গ	:	শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন	পৃ. ৩৬৩
২২।	বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস	:	এম, এ, রহিম	পৃ. ৫৮/৫৯
২৩।	The Indian Mushalman	:	W. W. Hunter (আব্দুল মত্তদুদ অনূদিত)	
২৪।	প্রাগুক্ত	:	(ঢাকা - ১৯৮২)	P. 164
		:		P. 160
২৫।	বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক	:	ডঃ নজরুল ইসলাম	পৃ. ১৫০
২৬।	তারাশঙ্কর রচনাবলী ১০ম খন্ড দে'জ পাবলিশার্স			পৃ. ৩৬৬
২৭।	প্রাগুক্ত			পৃ. ৪১৪/১৫
২৮।	দাঙ্গার ইতিহাস	:	শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৪০
২৯।	আমার সাহিত্য জীবন, ১ম খন্ড	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ ১০/১১
৩০।	প্রাগুক্ত			পৃ. ১১
৩১।	প্রাগুক্ত			পৃ. ২৪
৩২।	বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক	:	ডঃ নজরুল ইসলাম	পৃ. ২৫৬
৩৩।	আমার সাহিত্য জীবন (১ম খন্ড)	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ১৫১
৩৪।	গীতিকার : হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক	:	ডঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৫৮
	মালদহের ললিতমোহন শ্যামমোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী পত্রিকা (১৯৯৩) থেকে সংগৃহীত			
৩৫।	তারাশঙ্কর রচনাবলী-১০ম খন্ড	:	দে'জ পাবলিশার্স	পৃ. ৪০৬
৩৬।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ৪১৩/১৪
৩৭।	ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর	:	ডঃ মুক্তি চৌধুরী	পৃ. ১২৭/২৮
৩৮।	পঞ্চগ্রাম	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৩০/৩১

৩৯।	ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হিন্দু মুসলমান	:	অঞ্জন গোস্বামী	পৃ. ৯
৪০।	সাম্প্রদায়িকতা	:	বদরুদ্দীন উমর	পৃ. ৯
৪১।	ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হিন্দু মুসলমান	:	অঞ্জন গোস্বামী	পৃ. ১
৪২।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ৫০
৪৩।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ৫০
৪৪।	ভারতের মুক্তি সংগ্রামে মুসলিম অবদান	:	শান্তিময় রায়	পৃ. ৪১/৪২
৪৫।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ৬৯
৪৬।	তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (২য় খন্ড)	:	জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ. ৬০৩
৪৭।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ৫৯৯
৪৮।	প্রাগুক্ত	:	(৩য় খন্ড)	পৃ. ২৬
৪৯।	প্রাগুক্ত	:	(৩য় খন্ড)	পৃ. ২৫০
৫০।	প্রাগুক্ত	:	(৩য় খন্ড)	পৃ. ২৫১
৫১।	(Sumit Sarkar-Swadeshi Movement in Bengal-1903-1908) এই গ্রন্থ থেকে ইংরেজী উদ্ধৃতিকে বাংলায় অনুবাদ করে অঞ্জন গোস্বামী তাঁর "ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হিন্দু মুসলমান গ্রন্থে লিখেছেন			পৃ. ৫২

* * * * * * * * * * *